

Vol. 35 | No. 1 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার

Volume	35
Issue	1
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ভবতোষ দত্ত
Published online	October 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v35i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i1.1
Pages	1-15
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কবি -সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার

ভবতোষ দত্ত

কবি হিসাবে বিশিষ্ট বলে পরিচিত হবার অনেক আগে থেকেই মোহিতলাল মজুমদার কবিতা লিখে আসছিলেন। ১৯২২-এ প্রকাশিত *স্বপনপসারী* কাব্যেই তাঁর কবিবৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল। তার অনেক আগেই তাঁর কবিতা বেরিয়েছে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী-সম্পাদিত *জাহ্নবী*, কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের *বীরভূমি*, অমূল্য বিদ্যাভূষণের *বাণী*, এবং ইন্দ্রপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মানসী* পত্রিকাতে। তখন সাহিত্য-সমালোচনামূলক লেখা তিনি লিখেতেন না। কবিতা ছাড়া তিনি লিখেতেন অনুবাদ-গল্প, এবং কথিকাজাতীয় রচনা। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের *ভারতী*-তে তিনি লিখতে থাকেন ১৯১৮ থেকে। *মোসলেম ভারতে* তাঁর কয়েকটি ভালো কবিতা বেরিয়েছিল। *ভারতী* এবং *মোসলেম ভারতের* কবিতা দিয়েই তাঁর প্রথম কবিতার বই *স্বপনপসারী* । ১০৯১০-এ তিনি যখন কলকাতার কোনো ইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন তখনই নানা সাহিত্যিক চক্রে তাঁর যাতায়াত ছিল বলে তাঁর সেকালের ছাত্র নীরদ চৌধুরী জানিয়েছেনে।

মোহিতলালের কাব্যের ভাষা ও ভঙ্গি লক্ষ করলে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রবণতা চোখে পড়ে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রামের ইস্কুলে পাঠ শেষ করে মোহিতলাল যখন কলকাতায় এসেছিলেন কলেজে পড়তে, তখনও রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগ এসে গেলেও মোহিতলাল শিক্ষায় বা সাহিত্যে বাল্যকালে রবীন্দ্রযুগকে অনুভব করেন নি। কলেজে ভর্তি হবার পর ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যখন হয়, সেই সময় তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের আস্বাদ পেলেন। তিনি লিখেছেন—

> যেমনই স্কুল ছাড়িয়া কলেজের পাঠপদ্ধতির তাড়নায় ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে বৃহত্তর এবং ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের সূত্রপাত হইল, সেই সময় রবীন্দ্রনাথের একখণ্ড

> গল্পগুচ্ছ হাতে পড়িল। তাঁর পর কি হইল তাহা তখন ঠিক বুঝি নাই, কারণ মুগ্ধ অবস্থায় আত্মসমীক্ষা সম্ভব নয়। তাহার প্রয়োজনও থাকে না।— এই গল্পগুচ্ছই ছিল আমার রবীন্দ্রকাব্য প্রবেশিকা।
>
> — আধুনিক বাংলা সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ।

এই *গল্পগুচ্ছ* কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত গল্পগুচ্ছ নয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মজুমদার এজেন্সি থেকে *গল্পগুচ্ছে*র প্রথম খণ্ড বের হয় এবং দ্বিতীয় খণ্ড বের হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। এর আগে *ছোটোগল্প বিচিত্র গল্প কথাচতুষ্টয় ও গল্পদশক* প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য *গল্পগুচ্ছে* আগের গল্প কিছু নেওয়া এবং কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ করতে হবে *গল্পগুচ্ছকে* তিনি বলছেন 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবেশিকা।' অর্থাৎ ছন্দ মেলালেই যে কাব্য হয় না, কাব্যরসসৃষ্টির গভীরতর উপায় আছে, গল্পগুচ্ছ পড়তে গিয়ে মোহিতলাল সেটা অনুভব করলেন। এই গভীরতার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্য থেকে। কল্পনার ও রূপরচনার অসাধারণ বৈচিত্র্যে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্য থেকেই। মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথের কবিতা তখনও সর্ববাদিসম্মত হয়ে ওঠে নি। তখনও তাঁর রসসাফল্যে সন্দিগ্ধ কিছু পাঠক ছিল। রবীন্দ্রকাব্যের অনুরাগী পাঠকের মতো রবীন্দ্রকাব্যের বিরূপ সমালোচকও ছিল। যাঁরা সমালোচনা করতেন তাঁদের বিচারের মানদণ্ড ছিল ভিন্ন। সাহিত্যকে বিশুদ্ধ রূপে দেখার সংস্কার তখনও গড়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা রচনার ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় সেকালে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই যা তিনি লিখেছিলেন সে ছিল নির্বিশেষ সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ কবিতা। *সন্ধ্যাসঙ্গীত* থেকে আরম্ভ করে *কল্পনা–ক্ষণিকা* পর্যন্ত কবিতাগুলি শুদ্ধরসেরই কবিতা। ইংরেজি রোমান্টিক কবি এবং উনিশ শতকের শেয়ার্ধের শুদ্ধ শিল্পবাদী কবিদের কবিতার প্রভাব পড়েছিল রবীন্দ্রকাব্যে। তাঁর কবিতা হেম-নবীনের কবিতা থেকে ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সৌন্দর্য , প্রেম, প্রকৃতি হল কবিতার বিষয়। কবির কল্পনা সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের অভিসারী হল। মোহিতলালের কবিমানস ইংরেজি রোমান্টিক কবিতা এবং তারই সাদৃশ্যে নির্মিত রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাবে গড়ে উঠল। তিনি লিখেছেন,

> 'আমার প্রিয় কবি ছিলেন তিনজন, Tennyson, Keats ও Sandor. Swinburne না পড়ার কারণ আমাদের সময়ে Swinbarne-এর কবিতা প্রচলিত হয় নাই। Swinbarne-এর কাব্যও অতিশয় দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল।'

কিন্তু পরে তিনি নিজেকে সুইনবার্নের সমগোত্রীয় ভাবতে ভালোবাসতেন। মোহিতলাল কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই কবিতা লেখেন নি, একই সঙ্গে ইংরেজি কাব্যের প্রভাবও তিনি গ্রহণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তখন রবীন্দ্রযুগ। রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্যবোধ ক্রমেই সহজবোধ্য ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। মোহিতলালের কবিজীবনও তৈরি হয়ে উঠেছে এই দ্বৈত প্রভাবে। এই স্মরণীয় যুগ থেকেই মোহিতলালের কাব্যজীবনের উন্মেষ ও বিকাশ।

১৯০৮-এ মোহিতলাল মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। তার পরে এম-এ-তে ভর্তি হয়েও সাংসারিক অস্বাচ্ছল্যের জন্য পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেন নি। এ সময়ের কবিতা প্রায় কোনোটাই তিনি পরবর্তী কালে কোনো বইতে রক্ষা করেন নি। তাঁর তখনকার কবিতার একটি নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করছি। কবিতাটি অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের *বাণী* পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩১৭) বেরিয়েছিল—

নিশি না পোহাতে সকলের আগে জ্বলিত আমার বাতি।
ধূপের ধোঁয়ায় সুরভি নেশায় পরাণ ' উঠিত মাতি।
বাছা বাছা ফুলে স্বপনের ঘোরে ভরিয়া তৃণের ডালা
মন্দির কোণে একেলা বসিয়া গেঁথেছি আমার মালা।
অরুণ তখনও ওঠেনি উষার কনক উদয়াচলে,
গুঞ্জন ধ্বনি জাগে নি তখনও পূজার বেদিকাতলে।
একদিন সবে চাহিয়া দেখিনু ঘরে ঘরে দীপজ্বালা

—এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুতীরে' কবিতার ছায়া স্পষ্ট। তখনও মোহিতলালের স্বকীয়তা প্রকাশ পায় নি। নানা সাহিত্যিক সংসর্গে তিনি এসেছেন। সাহিত্যরসপিপাসু তরুণ কবি বিদেশী সাহিত্যের রসে মগ্ন হয়েছেন। তার প্রমাণ আছে *বীরভূমি* ও *মানসী*তে প্রকাশিত লেখায়। অনেক বিদেশী গল্পের অনুবাদ করেছেন। নিজের কবিভাষাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কাব্যধর্মী গদ্যভাষা তিনি লিখেছেন। কাব্যধর্মী কয়েকটি গদ্যরচনা তিনি জীবনের প্রায় শেষে *জীবনজিজ্ঞাসা* নামে বইতে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ রকম গদ্য তিনি আর লিখতে পারেন নি। এগুলি নিছক শিক্ষানবিশি রচনা নয়। এই রূপক রচনাগুলি পড়লেই একই সঙ্গে তরুণ কবির কল্পনাশক্তি এবং জীবনভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। হয়তো এরই মধ্যে ভবিষ্যৎ কবি মোহিতলালের আভাসও পাওয়া যাবে। "স্বপ্নসহানাটক' 'চুতঃসন্ধ্যা' এবং 'আমি'— *জীবনজিজ্ঞাসায়* সংকলিত এই

তিনটি গদ্যরচনাই ভাষা সৌন্দর্যে অপরূপ। ১৯১০-এর *মানসী*তে প্রকাশিত 'আমি' পরবর্তী কালে নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' নামক বিখ্যাত কবিতার প্রেরণা ছিল বলে মোহিতলাল উল্লেখ করেছেন। দুটি লেখা মিলিয়ে পড়লে এ রকম মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

১৯১৪ সালে মোহিতলাল সরকারী জরিপ বিভাগের কানুনগোর কাজ নিয়ে উত্তরবঙ্গে চলে যান। কুষ্টিয়া রাজশাহী শিলাইদহে তিনি বছর তিনেক ছিলেন। জরিপের কাজে তাঁকে রৌদ্রে বৃষ্টিতে মাঠে প্রান্তরে নদীচরে ঘুরে বেড়াতে হত। অনেক সময় তিনি ঘুরেছেন ঘোড়ায় চড়ে। কল্পনাপ্রবণ কবি নিজেকে কল্পনা করেছেন মরুচারী বেদুয়িন বলে যারা আরবের তপ্ত মরুভূমিতেও ক্রোশের পর ক্রোশ ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। তাদের যাযাবর-জীবন, উন্মত্ত প্রবৃত্তির নগ্ন বলিষ্ঠতা, মত্ত প্রতিহিংসা, অন্ধ-সম্ভোগ কবির চোখে এক নতুন কল্পনার জগৎ খুলে দিল। রবীন্দ্রনাথও এইভাবে এক জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন—

ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশে-দেশান্তরে। উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরবসন্তান
দুর্দম স্বাধীন।

কিংবা

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া উড়েছে বালি
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশি দিন।
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে
সকলই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য কল্পনাশক্তি বেদুয়িনের মরুজীবনকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছে। সেজন্য তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দরকার হয় নি। কিন্তু এই কল্পনা বাঙালির পক্ষে অবশ্যই ছিল অভিনব। বরং রবীন্দ্রকাব্যের পল্লীজীবন ও পল্লীপ্রকৃতি, বাংলার বর্ষা বসন্ত এবং স্নেহভালোবাসাময় সংসার ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তু। অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, এবং এঁদের পরবর্তী করুণাবিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় সকলেই প্রকৃতির মাধুর্যে ছিলেন সিক্ত। রুক্ষতা ভীষণতা, নীতিহীন মত্ত প্রকৃতির উন্মাদনা বাংলা কবিতায় প্রায় অপরিচিতই ছিল।

তিন বছরের যাযাবর-জীবনের অভিজ্ঞতা শুধু যে মোহিতলালের কাব্যেই পট পরিবর্তন ঘটাল, তা নয়। সাধারণভাবে বাংলা কবিতার ভাবপ্রকৃতিতেও প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিস্তার করল মোহিতলালের কাব্যের মধ্য দিয়ে। দুর্দাম উন্মত্ত জীবনের প্রতি একটা আকর্ষণ বাংলা কবিতায় নূতনতর সুর যোজনা করল। এই পর্যায়ের কবিতাই মোহিতলাল তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন— এই গুলিই তাঁর কাছে সংরক্ষণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে তিনি আবার পূর্বের মতো শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেন। পূর্বের মতোই নানা সাহিত্যিক চক্রে যোগ দিলেন। *যমুনা* এবং *ভারতী* পত্রিকার আপিস হল তাঁর প্রধান আড্ডাস্থল। এ সময়ে কলকাতায় আরও দুটি প্রধান সাহিত্যিক গোষ্ঠী ছিল— *সবুজপত্র* এবং *নারায়ণ*। মোহিতলালের সঙ্গে এদের যোগ ছিল না। *ভারতী* গোষ্ঠীর মধ্যমণি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি মোহিতলালের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। তাঁকে নিয়ে তিনি কবিতাও লিখেছেন। অসাধারণ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কোনো গভীর প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল, সে কথা মোহিতলাল অস্বীকারকরেছেন।[১] আপাতদৃষ্টিতে *ভারতী* পত্রিকা এবং সত্যেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে মোহিতলাল প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয় অন্তত ছন্দ এবং ভাষায়। *স্বপনপসারীর* ভাদরের বেলা 'তুমি ও আমি' 'চুড়ির আওয়াজ' ইত্যাদি কবিতায় এবং ফারসী পরিবেশ রচনার প্রয়োজনে লঘু কল্পনা ও দলমাত্রিক ছন্দের ব্যবহারে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল মনে হয়। এই প্রসঙ্গে মোহিতলালের দেওয়া একটা বিবরণ স্মরণ করি। *ভারতীতে* প্রকাশিত মোহিতলালের 'শেষপর্য্যায় নূরজাহান' নামের কবিতাটি পড়ে সত্যেন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন 'আমার কবর-ই-নূরজাহান ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'

মোহিতলালের একটি কবিতা— সম্ভবত 'অঘোরপন্থী' (আশ্বিন ১৩২৬) পড়েই সত্যেন্দ্রনাথ মোহিতলালকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। মোহিতলাল গভীর

শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন সত্যেন্দ্রনাথ মানুষ হিসাবে কত বড়ো ছিলেন, কত খাঁটি এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন— তা তিনি জানতেন বলেই সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রশংসায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

ভারতীতে প্রকাশিত এবং *স্বপনপসারী* কাব্যে সংকলিত অনেকগুলি কবিত বাঙালি জীবনকে নিয়ে লেখা। এমন কবিতার রসোচ্ছলতা পাঠককে মুগ্ধ করে। এগুলি বিশুদ্ধ রসেরই কবিতা। তাতে তত্ত্ব নেই, চিন্তা নেই, দার্শনিকতা নেই, বিষাদজড়িমা নেই। সংসার ও প্রকৃতিকে কতো সহজ সম্পর্শকাতরতায় তিনি দেখেছেন। কবি নিজেই একটি চিঠিতে লিখেছেন২–

> 'স্বপনপসারীর আগে অনেক কবিতা আছে, প্রকাশিতও হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলিকে কাব্যে স্থান দিই নাই। স্বপনপসারীই আমার কবিজীবনের পূর্ণ যৌবন কাব্যের Romantic প্রবৃত্তির উচ্ছল উৎসার হইয়া আছে। অনেকের মতে ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ কাব্য।'

স্বপনপসারী ১৯২২-এ প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষে *ভারতী* এবং *প্রবাসী* তে এর নূতনত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। অবশ্য *প্রবাসী* র সমালোচকের কাছে সব কবিতাই যে ভালো লেগেছিল তা নয় কিন্তু এর কোনো কোনো কবিতার মধ্যে এক অভিনব জীবনপ্রীতির সুর আছে বলে মনে হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথও এই কারণেই মোহিতলালের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করেছিলেন, বোঝা যায়।

ভারতী পত্রিকার সঙ্গে মোহিতলাল খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। শুধু কবিত লেখা নয়, *ভারতীর* 'মাসকাবারী' বিভাগে মোহিতলাল সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। ইতিপূর্বে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে সুসমৃদ্ধ বিষয়ানুগত আলোচন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করেন নি বলেই মনে হয়। এখানেই মোহিতলালে কাব্য ও কাব্যতত্ত্ব সমালোচনার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোহিতলাল তখন যা ভাবতেন, তার নিদর্শন উদ্ধৃত করছি:

> 'ভারতবর্ষ সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শিবকেও উপলব্ধি করেছে, কিন্তু সে শিব সত্য সুন্দরের সঙ্গে যুক্ত। সে কেবলই religionএর দ্বারাই সীমাবদ্ধ নয়। সে সকলের মধ্যে সত্যকে দেখতে চেয়েছে। অমানুষ বিক্রমে অসাধারণ সাহসে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সে পূর্ণ সত্যকে প্রত্যক্ষ করে তবে নিবৃত্ত হয়েছিল, অর্ধপথে থামে নি। তাই তার সুন্দর সত্যেরই রূপ–সম্পূর্ণ সছন্দিত। তার মধ্যে অসঙ্গলের কল্পনাও থাকতে পারে না। এই সত্য সুন্দরের আনন্দ, ভাব থেকে রূপে যখন সুপ্রকাশ হবে— নূতনআর্টের জন্ম হবে, তখন সত্যসুন্দরকে, তত্ত্ব বিচারে নয়, ভাবের ভিতর দিয়ে আমরা লাভ করব। তাই হয়েছে, সেই আর্টের জন্ম হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। এই সত্যসুন্দর intllect ও feelingএর অপূর্ব সমতা রক্ষা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায়।

> সুন্দরের মধ্য দিয়ে সত্যের উপলব্ধি সত্যের প্রেরণায় সুন্দরের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, এমন করে যা আর কখনও হয় নি। ঋষিরা যাকে ভাবের মধ্যে পেয়েছিলেন ও চিন্তার আকারে গেঁথে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই রূপের মধ্যেই পেয়ে আর্টে সুপ্রকাশ করেছেন।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বের এই স্বীকৃতির মধ্যে কোনো দ্বিধা সংশয় নেই। সত্যসুন্দর দাস নাম দিয়ে মোহিতলালের এই লেখা ১৯২০-র *ভারতীতে* যখন বেরিয়েছে তখন তার মধ্যে কোনো রবীন্দ্রবিদ্রোহিতার সুর নেই। স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে–এইমাত্র। মোহিতলালের এই সমালোচনায় সুন্দরের স্বীকৃতিই ছিল প্রধান— দৃষ্টিভঙ্গিতে পশ্চিমী শুদ্ধশিল্পবাদীদের (art for arts sake পন্থী) মতের সঙ্গে মিল দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে আর্টের সার্থকতা রূপ বা ফর্মের সম্পূর্ণতায়। এ মত তাঁর পরের সমালোচনায় বিস্তারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও তাঁর মুল বক্তব্যের পরিবর্তন হয় নি।

মোহিতলাল যখন ভারতীতে কবিতা লিখছেন তখন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিতা লিখছেন *মানসী* ও *মর্মবাণী* এবং *উপাসনা* পত্রিকায়। নজরুল ইসলাম তখনও কলকাতার সাহিত্যসমাজে আত্মপ্রকাশ করেন নি। 'ঘুমের ঘোরে' পর্যায়ের সুপরিচিত যতীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি বেরিয়েছে *যমুনা* পত্রিকায়। যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের কবিতা প্রকৃতিতে আলাদা। *স্বপনপসারীর* সৌন্দর্য স্বপ্ন যতীন্দ্রনাথের নেই। তাঁর কবিতায় রুক্ষ বাস্তবতার সুর। বাস্তবতাবোধ থেকে যতীন্দ্রনাথ হানলেন ব্যঙ্গবাণ সব রকম ভাবসত্যের প্রতি। আর মোহিতলাল মানুষের বাস্তবপ্রবৃত্তি, দেহ জীবনসত্য, বাঁচবার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে একটা গভীরতর দার্শনিকতাপূর্ণ কাব্যরূপ দিতে অগ্রসর হলেন। জীবনকে এতকাল তিনি রস হিসেবেই আস্বাদন করেছেন, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ধ্যান ও চিন্তা। মোহিতলাল নিলেন দেহবাস্তবকে। *স্বপনপসারীর* চার বছর পর *বিস্মরণী* (১৯২৬) প্রকাশিত হল। এর কতকগুলি *কবিতা ভারতীতে* এবং কতকগুলি *প্রবাসীতে* বেরিয়েছিল। *কল্লোলে* বেরিয়েছিল বিখ্যাত 'পান্থ'। *বিস্মরণীর* অনেক কবিতা বাংলা সাহিত্যে চিরপ্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই কবিতাগুলি যখন লেখা হয় অর্থাৎ ১৯২০ থেকে ১৯২৬–এর মধ্যে তখনকার কথা স্মরণ করে নীরদ চৌধুরীর অগ্রজ চারুচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন—

> 'Indeed the last twenties during which Mahitlal composed the poems of Vismarani and Smara-garal. Seem to be the height of his creative period. During three years he was a constant visitor to our house in

North Calcutta in which my brother Nirod, the 'unknown Indian' and I used to live and I can claim to be one of the very first who heard from his own lips manay of these poems before they were published. As soon as he had written a poem he would come over to read it out to us and I still seem to hear the echo of the stentarian voice with which he used to recite the poems.'

শব্দচিত্রের ঐশ্বর্যে, বর্ণে ও সঙ্গীতের প্রাচুর্যে, অসাধারণ শব্দসঙ্গীতে ভাস্কর্যপ্রতিম কাব্যদেহগঠনে এবং সংবেদনশীলতায় মোহিতলালের কবিতাকে তিনি কীটস্-এর কবিতার সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করেন। মোহিতলালের কবিতার ঐন্দ্রিয়সংবেদনা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত পরিচ্ছন্ন ও সুনির্দিষ্ট। তাঁর ইংরেজি লেখাই উদ্ধৃত করছি। মোহিতলালের কাব্যের বিচার এখানে সংক্ষিপ্ত আয়তনে স্পষ্ট—

Perhapes the emphasis he laid on the expericnec of the senses led Mohitlal to believe that he was a comparison of Swinburne. But in this too he is nearer Keats. There is nothing more Sensuous in his poetry. For him all sensuous experience is transfigured by a moral purpose behind. In several of his poems notably in his ode to Schopenhauer (in which by the way he has used a stanza in imitation of the Spensarian but consisting of seven lines instead of nine with consummate skill) he has treated of the mystry of love. His conception of love is not Platonic or mystic which seeks to sublimate the deepest instinct of all beings into on ethereal channel. His exaction of the body and his adoration of Veuns Genetrix are based upon an acaptance of the urge which impels a being to seek out a mate and which compels it to sacrifice a part of itself for the perpetration of the bodily existence as a fundamental fact of lie.

শরীরী কামনার এমন জয়গান বাংলা সাহিত্যে আর শোনা যায় নি। রবীন্দ্রযুগের পরিচ্ছন্ন শুচিতাবোধে মোহিতলালের কবিতা যেন আঘাত হানল।

একদিক দিয়ে যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রযুগের কল্পনাসর্বস্বতার বিরোধিতা করে বাস্তবতাবোধের প্রবর্তন করলেন। মোহিতলাল আর একদিক দিয়ে দেহ কামনার বাস্তবতাকে শুধু স্বীকৃতি নয়, তার প্রশস্তি করলেন।

বাংলা সাহিত্যের এই সময়টা অর্থাৎ বিশ শতকের চতুর্থ দশকটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে নানা সাহিত্যিক বিতর্ক ও আন্দোলনের দ্বারা। রবীন্দ্রযুগের মধ্যে থেকেই মোহিতলালের আবির্ভাব। আবার মোহিতলাল নতুন যুগের কাব্যগুরু। এই বিষয়টাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। যতীন্দ্রনাথ–মোহিতলালের বিদ্রোহের সত্যকার মর্মটি কী? এই সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের একটা ভিন্নতর পর্বের আভাস পাওয়া যায় সেটাও তো অস্বীকার্য নয়। ১৯২৩–এ *কল্লোল* পত্রিকা প্রকাশের পর্বে নবীণ কবি নজরুল ইসলামকে বরণ করে নিলেন মোহিতলালই। *মোসলেম ভারত* পত্রিকায় প্রকাশিত মোহিতলালের সেই বিখ্যাত চিঠি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। নজরুলকে সম্বোধন করে মোহিতলাল লিখেছিলেন একটি চমৎকার কবিতা—'কবি বিদ্রোহীর প্রতি'। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল *প্রবাসীতে* (১৩৩০ আষাঢ়)। সতোরোটি শ্লোকের এই দীর্ঘ কবিতার তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি।—

মাথায় তোমার কৃষ্ণ মেঘের নিশান দোলে।
নহে তো অশ্রু। তরল তড়িৎ চোখের কোলে।
ও কি ও পিপাসা! নিদারুণ আশা বক্ষে ধরি
ঘোষিছ প্রলয় ডমরু নিনাদ বজ্ররোলে।

তুমি শুধু ডাকো— 'জাগো সব জাগো',আলোক জাগে
হিরণ কিরণ প্রাণের দুয়ারে প্রবেশ মাগে।
মোর মুখে তোরা চেয়ে দেখ দেখি, অবিশ্বাসী!
এমন হাসিটি দেখেছিস কোনো গোলাপবাগে?

হে কবি নবীণ জীবন তোমার মুক্তধারা
তুমি গাও গান'— শুনিবে সকলে নিদ্রাহারা।
দাও বিশ্বাস, দাও আশ্বাস, অভয়বাণী
আলোক–আঘাতে ভেঙে দাও ওই আঁধারকারা।

এই কবিতা মোহিতলাল লিখেছিলেন নজরুলের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার পরে।[৫] আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, মনোমালিন্য সব সময় চিরস্থায়ী হয় না। এই সূত্রেই মোহিতলালের পত্নী তরুলতা মজুমদারের স্মৃতিচারণ স্মরণ করি—

'স্বামীর কবিতা ছাপা হত নানা পত্রিকায়। অনেক সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন বিশেষ করে

> মনে পড়ে কবি নজরুল ইসলামকে। নজরুল রসিক প্রাণবান্ ফূর্তিতে উচ্ছল মানুষ। নজরুল বড়ো ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন তার স্বামীকে। কতদিন এসেছেন বাড়িতে। আপন মানুষের মত ভাত খেয়েছেন স্বামীর সঙ্গে, তরুলতা নানা রকমের রান্না পরিবেশন করেছেন, খাওয়া হয়ে গেলে থালা বাসন পরিষ্কার করেছেন।[৬]

যাই হোক বাংলা সাহিত্যে এই ভুল বোঝাবুঝির কোনো প্রভাব নেই। অপরপক্ষে মোহিতলাল যে নজরুলকে সাহিত্যের আসরে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে। নজরুল *কল্লোলের* কাব্যান্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে তখন প্রচণ্ড তর্ক। তার বিচিত্র বিবরণ দেওয়া এখানে অনাবশ্যক। যে নবীণ কবিতার আন্দোলনে মোহিতলাল প্রথমে যোগ দিয়েছিলেন বলিষ্ঠ কল্পনা নিয়ে, তার থেকে তিনি সরে গেলেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায় তিনি কল্লোলের দল থেকে চলে গেলেন পল্লবের দলের অর্থাৎ *শনিবারের চিঠির* গোষ্ঠীতে। কেন তিনি এঁদের সঙ্গে যোগা দিলেন? যাঁকে ওরা বরণ করে নিয়েছিলেন আধুনিকোত্তম বলে যাঁর প্রতিকৃতি ওরা ছাপতে চেয়েছিলেন *কল্লোলের* প্রথম পাতায়। তিনি অকস্মাৎ কেন ভিন্ন পথগামী হলেন? সে ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেন নি। সবাই একে ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলেই মনে করেছে। এর মধ্যে কোনো সত্যকার সাহিত্যিক মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল কিনা সেটাও কিন্তু ভাবা দরকার। পরে দেখা গেছে মতামতে তিনি আধুনিক কবিতার ঘোর বিরোধী। কোথায় একটা আদর্শভেদ ঘটে গেছে। এর ব্যাখ্যা পেতে হলে মোহিতলালের কবিতাকে ভালো করে বুঝতে হবে। মনে পড়ে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকেও। সেকালের নবীন কবিরা উৎফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথকে তাঁদের সগোত্র বলে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথও যোগ দিয়েছিলেন *শনিবারের চিঠিতে* এবং লিখেছিলেন 'তরুণের লজ্জা'।

১৯২৮এর জুলাই মাসে মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে যান। সাধারণ বি-এ পাস হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হতে পেরেছিলেন। এর মূলে ছিল তাঁর আজীবন বন্ধু ডক্টর সুশীলকুমার দে-র সহায়তা। তখন মোহিতলালের মাত্র দুটি কবিতার বই বেরিয়েছে— *স্বপনপসারী* এবং *বিস্মরণী*। গদ্যের বই কিছু নেই। সমালোচক হিসাবে তিনি কত বড়ো হতে পারেন সাধারণ লোকের তা জানবার উপায় ছিল না। কিন্তু বন্ধু সুশীলকুমার জানতেন। সুশীলকুমারের সেই জানা যে কত খাঁটি মোহিতলাল তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর প্রমাণ রেখে গেছেন। তখন কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছেন, মনোনিবেশ করেছেন গদ্য প্রবন্ধ রচনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়ে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল। *স্বরগরল* (১৯৩৬) এবং *হেমন্ত-গোধূলি* (১৯৪১)।

এর কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল অনেক আগেই। 'স্বরগরল' নামটা তাঁর কাব্যকল্পনার যথার্থ ভাবদ্যোতক। কবির সেই কামতৃষ্ণা তাঁর জীবনতৃষ্ণারই নামান্তর। *'হেমন্ত-গোধূলি'* নামটা কবিজীবনের অবসানসূচক। হেমন্তে অগ্রহায়ণ মাসে শীতের সূচনায় কুয়াশা নেমে আসে। পাতা হলুদ হয়ে আসে। হেমন্তকালের পরিপক্ব শস্যের পূর্ণতাকে তিনি ভোলেন নি যদিও কালিদাস তুষারপাতে মুদিত পদ্মকোরকের কথা বলেছেন—

> নবপ্রবালোক্ষামশস্যরম্যঃ প্রফুল্ললোধ্রর পরিপক্বশালিঃ
> বিলীনপদ্মঃ প্রপাতত্বষারো হেমন্তকালঃ সমুপাগতোহয়ম্

কবি জীবনানন্দের কাব্যেও হেমন্ত ঋতুতে শস্য ক্ষেতের বর্ণনা পূর্ণতারই প্রতীক। ধান কাঠা মাঠে তিনি রিক্ততাকে দেখেন নি, দেখেছেন কমলারঙের রোদে রাঙানো পৃথিবীর অপরূপতাকে। মোহিতলালের 'হেমন্ত' বাক্‌প্রতিমায় তার ব্যঞ্জনা আছে অর্থাৎ কবিজীবনের পূর্ণতার শেষে প্রত্যাশিত উপসংহারে মোহিতলাল অবসানের ব্যঞ্জনা এনেছেন। হেমন্ত-গোধূলির কবিতাগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা। তাঁর অন্য কাব্যে বিষয় বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের মধ্যে ভাবনাগত যোগ আছে। *স্বরগরল* কাব্যে বুদ্ধ এবং 'নারীস্তোত্র' বিষয় ভিন্ন কিন্তু এদের মধ্যে জীবনদর্শনগত মিল আছে। *হেমন্ত-গোধূলির* কবিতাগুলি ছন্দে ভাষায় সুমার্জিত ও পরিচ্ছন্ন। এর কবিতায় *বিস্মরণীমরগরলের* দার্শনিক ভাবুকতা নেই। কিন্তু এর বিশেষত্ব হচ্ছে এতে আছে কবির ব্যক্তিগত আত্মপরিচয়জ্ঞাপন। সেইজন্য এ কাব্য সাবজেকটিভ এবং লিরিক্যাল। কবি নিজের মনের ইতিহাস দিয়েছেন নাম কবিতায়—

> ফুটে ছিল যারা যৌবন বৈশাখে
> রৌদ্র মদিরা গান করি পাখে পাখে,
> যত তাপ তত সরস তাদের তনু।
> হাসিতে যাহারা হাহাকার চেপে রাখে—
> তারা নাই আজ, ভয় নাই এস তুমি।
> বরিষার শেষে শীতল আজি এ ভূমি
> উদিবে এখনি কার্তিকী পূর্ণিমা
> হিমনিষিক্ত ধরণীর মুখ চুমি।

হেমন্ত-গোধূলিতে মোহিতলালের কয়েকটি বিখ্যাত অনুবাদ-কবিতা সংকলিত আছে। তাদের মধ্যে 'নাগার্জুন' এবং 'প্রেতপুরী' *কল্লোলের* লেখকদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। মার্কিন কবি জর্জ সিলভেসটার ভিরেকের কবিতার

অনুবাদ হলেও ভাষা ও ভঙ্গিতে মোহিতলাল আশ্চর্য মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন—

> আমি যে বেসেছি ভাল দুইজনে, সমান সোহারে
> বালাবধূ যশোধরা, বারাঙ্গনা বসন্তসেনারে।।

কবিতার ভাব যেমন যথার্থ মোহিতলালেরই উপযুক্ত, তেমনি আধুনিকতাবাদী *কল্লোল* কবিদেরও অনুকূল। এই ভাবটিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে শুনি অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাতেও। ভিরেকের আর একটি কবিতার অনুসরণে মোহিতলাল লিখেছিলেন 'তীর্থপথে'। কবিতাটি বেরিয়েছিল *উত্তরায়* ১৯২৬–এ! তাঁর শোপেনহাউয়ারের উদ্দেশে লেখা 'পান্থ' এবং অনুবাদ কবিতা 'প্রেতপুরী' বেরিয়েছিল *কল্লোলে* (১৯২৫)। 'নাগার্জুন' বেরিয়েছিল *কালি ও কলমে* (১৯২৬)। বস্তুত *হেমন্ত-গোধূলিতে* নতুন লেখা কবিতার সংখ্যা কম।

ঢাকায় যাওয়ার আগে মোহিতলাল এক প্রচণ্ড সাহিত্যিক বিতর্ক দেখে গিয়েছিলেন। আধুনিকদের সঙ্গে প্রবীণদের সেই বিখ্যাত সাহিত্যিক বিতর্কের সূত্রে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে রবীন্দ্রনাথ নবীন ও প্রবীণ লেখকদের আলোচনায় আহ্বান করেছিলেন ১৩৩৪এর চৈত্র মাসে। সে–সভায় মোহিতলালও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিছু বলেন নি, বলেছিলেন তাঁর ছাত্র নীরদ চৌধুরী। লক্ষ করবার বিষয় এই সভার কিছুদিন আগে বেরিয়েছে মোহিতলালের 'প্রেতপুরী'। আবার এই বিতর্কের সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'সাহিত্যধর্ম' এবং 'সাহিত্যের নবত্ব'। মোহিতলাল লিখেছিলেন 'সাহিত্য ও যুগধর্ম' (শ্রাবণ ১৩৩৪)। এই প্রবন্ধে তিনি একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি লিখলেন —

> 'অনেক উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি এই বাস্তব ও দেহচেতনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কবির নির্লিপ্ত চিত্তের কল্পনাশক্তিই তাহা হইতে রসসৃষ্টি করিয়েছে বটে, কিন্তু তাহার উপাদান হইয়াছে অতি তীক্ষ্ণ দেহচেতনা। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে নানা ধরনের বিরোধ।'

মোহিতলালের কাব্য দেহচেতনাশ্রিত। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অকুণ্ঠ পৌরুষের প্রশংসা করেছেন। এদিক দিয়ে মোহিতলাল নবীন কবিদের দেহসচেতনতাকে একেবারে বিকৃত করতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, তাঁর রচনায় পূর্বযুগের আইডিয়ালিজম পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান অথচ অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

বিচিত্রা সভার পরেই মোহিতলাল ঢাকায় চলে যান। অতঃপর শুরু হল তাঁর

সমালোচক জীবন। অবশ্য কিছু কিছু লেখা তিনি আগেই লিখেছেন। ১৯২৬এ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর সমালোচনার পোনেরো আনাই লেখা হয়েছে ঢাকায় যাওয়ার পর। *ভারতী* ও *প্রবাসীতে* 'কাব্যকথা' নাম দিয়ে সে-আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তখন সেটা সম্পূর্ণ না হলেও পরে ১৯০৮এ *সাহিত্যকথা* বইতে সেই আলোচনা ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত করেছিলেন। *ভারতীর* প্রেরণা ও পরবর্তী কালের প্রেরণা ঠিক একরকম ছিল না। *সাহিত্যিকথা* র প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে একটি স্মরণীয় সাহিত্য-আন্দোলনের পরে। সাহিত্যের ধর্ম কী, আদর্শ কী, প্রকৃতি কী, জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী — এসব আলোচনাকে তিনি প্রায় একটা দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপন করেন। ক্রোচের প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল, একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়। মোহিতলাল সাহিত্য বিচারের একটি সূত্র দিয়েছিলেন। তার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ'। এধরনের বিচার রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। সম্ভবত নলিনীকান্ত গুপ্ত ব্যতিক্রম। মোহিতলাল তাঁর যৌবনকালে অভ্যস্ত ভিকটোরীয় যুগের সাহিত্য সমালোচনার আদর্শকে এড়াতে পারেন নি। এ সি ব্ল্যাডলির মতোই তাঁর সাহিত্য সমালোচনায় দার্শনিকতা এসে যায়। ওয়ালটার পেটার, ম্যাথু আরনল্ড, মিড্‌লটন মারি, ব্ল্যাডলি যে পদ্ধতিতে *সাহিত্যতত্ত্বকে* প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, বাংলায় মোহিতলাল তাই করেছেন। আজকাল নাকি এ পদ্ধতি পুরনো হয়ে গিয়েছে। সাহিত্যতত্ত্বের নতুন পদ্ধতি ও বিচারের প্রচলন হয়েছে। অবশ্য এই মর্মে রবীন্দ্রনাথের *সাহিত্য* বইয়ের প্রবন্ধগুলিও পুরনো হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। কিন্তু এটা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে মোহিতলালের ভাবগম্ভীর প্রবন্ধগুলি এখনও পাঠকের চিন্তাকে জাগিয়ে দেয়। তত্ত্ববিশ্লেষণে পাঠকমনকে শাণিত করে। বিশ শতকের চতুর্থ দশকে *শনিবারেরচিঠিতে* মোহিতলালের এই প্রবন্ধগুলি নিয়মিত বের হত। মোহিতলাল বলেছেন, অপ্রীতিকর দুঃখকর আলোচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সজনীকান্ত, মোহিতলালের উপর ভার ছিল সাহিত্যের শাশ্বত আদর্শ ব্যাখ্যা করার। তখন এর প্রয়োজন হয়েছিল তথাকথিত নবীণ লেখকদের আদর্শভ্রষ্টতা নিবারণের জন্য। মোহিতলালের এই লেখাগুলির পিছনে ছিল সাহিত্যের গঠনমূলক আদর্শের প্রেরণা। সত্যকার সাহিত্য কী তার আদর্শকে বুঝিয়ে দেওয়া। এতে কোনো তাৎক্ষণিক ফল হয়েছিল কিনা বলা যায় না। তবে *পরিচয় পূর্বাশা* প্রভৃতি intellectual পত্রিকা সাহিত্যকে অনেক দায়িত্ব ও গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। নতুনের যে ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল *কল্লোল* থেকে, সে ধারা পরে হয়েছিল গম্ভীর সংসম্পূর্ণ। মোহিতলাল

মনে করতেন *শনিবারের চিঠি* এবং তাঁর লেখায় কিছু কাজ হয়েছিল।

মোহিতলালের সাহিত্য সমালোচনায় একটা দ্বৈততত্ত্ব আছে। একদিকে তিনি শুদ্ধশিল্পবাদী, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে বিশ্বাসী। সাহিত্য সৃষ্ট হয় কবির নিবিড় উপলব্ধি থেকে। আর একদিকে তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের সঙ্গে জাতি এবং সংস্কৃতির যোগ ঘনিষ্ঠ। সাহিত্যে যা প্রকাশ পায় তা জাতীয় চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি। বাংলা সাহিত্যে বাঙালির চিন্তাচেতনাই প্রকাশ পাবে। শুদ্ধশিল্পবাদী-দের কাছে জাতি বা সমাজের কোনো ভাবনা নেই। সেযোগ আবিষ্কার করবার চেষ্টা বৃথা। সাহিত্যকে নিছক রসেরই রূপ বলে দেখতে হবে। মোহিতলাল রসশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরে বাঙালির সংস্কৃতি বাঙালির বৈশিষ্ট্যের ভাবনায় বিশেষভাবেই মগ্ন ছিলেন। *ভারতীর* প্রবন্ধগুলি লেখার সময় এই ভাবনাটা প্রবল ছিল না। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত *আধুনিক বাংলা সাহিত্য* বইয়ের প্রবন্ধগুলি উনিশ শতকের বাঙালি কবিদের আলোচনা। এই আলোচনায় মোহিতলাল বাংলা সাহিত্য পাঠের যে-গভীরতা দেখিয়েছেন, তা সত্যই দুর্লভ। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এই বইটি বাঙালি পাঠককে শ্রদ্ধাবান্ করে তুলেছে। আজকাল সেকালের সাহিত্য নিয়ে প্রচুর তথ্যমূলক গবেষণা চলেছে। কিন্তু বিহারীলাল, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে মূল কথাগুলি মোহিতলাল বলে গিয়েছেন, তাকে সাহিত্য বিচারে এখন কেউ অতিক্রম করে যায় নি। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে বাঙালির ভাবনটা আলাদাভাবে যেমন চোখে পড়ে না সে–চিন্তাটা মোহিতলালকে ক্রমেই অধিকার করতে লাগল। সাহিত্য রসের সৃষ্টি হলেও দেশকালবর্জিত নয়। লেখকের দৃষ্টি মন চেতনা দেশের আবহাওয়া ও সংস্কৃতি থেকেই রূপায়িত হয়। এই চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'বাঙালির বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধে (*শনিবারের চিঠি*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)। এই প্রবন্ধটি *আধুনিক বাংলা সাহিত্য* বইতে প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে সন্নিবিষ্ট হয়। কিছু দিন আগে *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল বাঙালির বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, মোহিতলালে তারই প্রভাব পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে *বাংলা ও বাঙালী* বইতে মোহিতলাল বাঙালি জীবনে ধর্মে আচারে তন্ত্রে ও সহজিয়া সাধনার গূঢ় প্রভাবকে দেখাতে থাকেন। *বাংলার নবযুগ* বইতে বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে নবযুগের ভাবধারার সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির যোগাযোগ ব্যাখ্যা করে বোঝান। এভাবে বাংলা সাহিত্যকে আর কেউ ব্যাখ্য করেন নি। এটা মোহিতলালের সমালোচনার স্বকীয়তা। এবৈশিষ্ট্যের চূড়ান্তপরিচয়তিনিদিয়েছেন *শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র* বইতে।

১৯৪৪এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে মোহিতলাল আট বছর

সাহিত্য সমাজের বাইরে নির্বাসিত জীবন যাপন করে গেছেন। যিনি সাহিত্যিক আড্ডা ছাড়া কোনোদিন থাকতে পারেন নি, তাঁর আর কোনো আড্ডাই ছিল না। *বাংলার নবযুগ কবি শ্রীমধুসূদন* এবং *বাংলা কবিতার ছন্দ* এই তিনটি বই ধারাবাহিকভাবে *শনিবারের চিঠিতে* প্রকাশিত হয়ে গেলে এই পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। *শনিবারেরর চিঠি* আদর্শ পবিবর্তন করেছিল। মোহিতলাল করেন নি। বাঙালিদের ভাবনাটা মোহিতলালের সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। যৌবনে যে বাঙালিকে তিনি দেখেছিলেন পরবর্তীকালে নানাদিকে বিস্তার সত্ত্বেও বাঙালির সেই উজ্জীবন আর ছিল না। ভারতীয় সত্তার কাছে বাঙালি নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে পেছিয়ে এসেছে। বাঙালি তার স্বভাবধর্ম–রস ও প্রীতির মন্ত্র ছেড়ে নিরবকাশ আদর্শে দীক্ষা নিয়েছে। এ দীক্ষা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এজন্যে মোহিতলাল মনে করতেন বাংলার জাগরণ অর্ধপথে স্তম্ভিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ রকম ভাবনার ফলে মনের দিক দিয়ে মোহিতলাল হলেন নিঃসঙ্গ। তাঁর শেষ কয় বছরের মর্মন্তুদ বেদনার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়ে গিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম ছাত্র নীরদ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে লেখা চিঠিতে। সেই চিঠিগুলির ইংরেজি অনুবাদ দিয়েছেন নীরদবাবু তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় ভাগ Thy Hand Great Anarch বইতে।

তথ্যনির্দেশ

১ দ্রষ্টব্য: ঢাকার মুসলিম হল বার্ষিকীতে (চৈত্র ১৩৪১) প্রকাশিত পত্রিকা সম্পাদক ও মোহিতলালের প্রশ্নোত্তর। আলোচনাটি উদ্ধৃত হয়েছে আমার কাব্যবাণী (২ সং ১৯৯১)-র ৯১–৯৫ পৃষ্ঠায়।

২ ভবতোষ দত্তকে লিখিত পত্র, মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ (১৯৬১) পৃ ৮৪–৮৫

৩ ভারতী মাঘ ১৩২৬ 'ভারতীয় সাধনা', পৃ ৮১৫

৪ *Hindusthan standard*, 17 August 1952. Sunday

৫ এ-সম্পর্কে আজহারউদ্দিন খান এবং ভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত *মোহিতলালের পত্রগুচ্ছের* (১৯৬৯) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৬ 'মোহিতলালের সহধর্মিণী তরুলতা দেবী', কিরণকুমার রায়–লিখিত। *আনন্দবাজার পত্রিকা*', বুধবার, ৫ অক্টোবর ১৯৬৬